বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাদকাসক্তির প্রভাব ও তার সমাধান

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মো. মুস্তাফিজুর রহমান

মো. মোশাররফ হোসাইন

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

آثار المخدرات في اقتصاد بنغلاديش وسبل مكافحتها

« باللغة البنغالية »

د. محمد مستفيض الرحمن

محمد مشرف حسين

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

মাদকাসক্তি: বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব

মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকাসক্তি সম্বন্ধে ধারণা জন্মে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে।[1] প্রাচীন যুগ থেকেই ওষুধি বৃক্ষ, গাছের মূল, ছাল, পাতা ও লতাগুল্ম বেদনা উপশমের আর রোগ সারানোর কাজে ব্যবহৃত হতো।[2] কিন্তু সাম্প্রতিকালে মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার আতঙ্কজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কি না সকল সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে গেছে।[3] উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল বাংলাদেশেও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইউএনডিপি'র দেয়া ১৯৯৯ সালের এক তথ্যে জানা যায়, সারা পৃথিবীতে মাদকাসক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ ভাগ কিন্তু বাংলাদেশে এর হার প্রায় দ্বিগুন তথা ৩ দশমিক ৮ ভাগ। এ হিসাবে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।[4] বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা এ সংখ্যা কম-বেশি ৫০ লাখ ধরেই তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ভয়ংকর

---

[1] ভাস্কর পাল, "করুণ থেকে করুণতর যার পরিণতি" দেশ, ৫৫ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১৬ জুলাই, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪; আবু তালেব, হেরোইন আর এক মরণাস্ত্র, খুলনা, অমরাবর্তী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ক।

[2] কাজী আলী রেজা (সম্পাদিত), জাতিসংঘ এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, (ঢাকা: জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ডিসেম্বর, ১৯৯১), পৃ. ৩।

[3] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

[4] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা: ২৭ অক্টোবর, ২০০৪, পৃ. ৩।

ক্ষতি সর্বজন বিদিত। বাংলাদেশের মতো হতদরিদ্র দেশে, যেখানে জনসংখ্যা ধারণ ক্ষমতার চাইতেও বেশি-দরিদ্র, বেকারত্ব, কমংসংস্থানের অভাব, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক মন্দাভাব, হত্যা, সন্ত্রাসসহ হাজারো সমস্যা প্রতিনিয়িত মানুষের তাড়া করছে সেখানে মাদকের হিংস্র থাবা বিস্তার করলে পরিস্থিতি কেমন ভয়াবহ হবে তা চিন্তা করলে গা শিউরে উঠে। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করে তুলছে বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার রোধ করা গেলে প্রতি বৎসর জাতীয় বাজেটে সাশ্রয় হবে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। মাদকাসক্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে বের হয়ে আসে এমন একটি তথ্য, যা বদলে দিতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারা। চাঙ্গা করতে পারে বিপর্যন্ত, ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতিকে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং তা থেকে সহজে মুক্তির উপায় আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি

পবিত্র কুরআনে ‘মদ’ বা ‘মাদক’ প্রসঙ্গে আরবী ‘খামর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার বাংলা প্রতিশব্দ মাদক; মদ; মাদকতা;

নেশাগ্রস্ততা ইত্যাদি।[5] মাদক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল: an intoxicant consisting of opium, used for smoking[6] আর 'খামরা'' বা মদ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Wine, port; liquor, alcoholic beverage, (alcoholic) drink, intoxicant, inebriant, booze; alcohol, sprits ইত্যাদি।[7] খামর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিলুপ্ত করা, লুকিয়ে ফেলা।[8] বিবেক ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয় এমন সব কিছুই হল মদ তথা নেশার জিনিস বা মাদ্রকদ্রব্য।[9] যেহেতু মদ মানুষের বিবেক ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তাই একে 'খামর' বা মদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।[10]

---

[5] বাংলা একাডেমী, আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৭২ (পূর্ণমুদ্রণ ডিসেম্বর, ১৯৯৩), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১২৬৯।

[6] বাংলা একাডেমী, আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ জুন, ১৯৯৪ পৃ. ৬৩৩।

[7] ড. রূহী বা'লাবাক্কী, আল মাওরিদ (আরবী-ইংরেজী অভিধান), লেবানন: দারুল ইলম লিল-মালাঈন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২৩।

[8] আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দু), দিল্লী: ইদারা তাবলীগে দ্বীনিয়াত, জামে মসজিদ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ১৯৬।

[9] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মোহাম্মদ আবু জাফর খান, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৪, (সুলভ সংস্করণ-৫) পৃ. ৩।

[10] ইবনে মানজুর, লিসানুল-আরব, (বাইরুত-লেবানন: দারু ইহইয়াহ আততুরাছ আল-আরাবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭), চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২১১।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর মাদকদ্রব্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, হেট্রোসাইক্লিক ঔষধযুক্ত একটি প্রাকৃতিক বা আধা-প্রাকৃতিক বা সিনথেটিক নাইট্রোজেন যা সাধারণভাবে ঘুম বা অচেতন হয়ে উদ্বুদ্ধ করে উপশম প্রদান করে এবং এর সাথে আসক্তি জড়িয়ে দিয়ে ইহার উপর নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মাদকদ্রব্য বলে।[11]

UNDCP- মাদক যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হল Intoxication (N): It is the state that results from the intake of a quantity of a substance which exceeds the individual's tolerance and produces behavioral and physical abnormalities. [12]

---

[11] মোঃ আব্দুল রব মোল্লা ও মুহাম্মদ সাইফুল আলম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিনিমালা, (ঢাকা: সামছ পাবলিকেশন্স, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, প্রথম প্রকাশ-২০০২), পৃ. ১৭।

[12] Department of Narcotics Control and United Nations International Drug Control Programme (UNDCP); Training Package on Treatment and Rehabilitation of Drug Addicts. p. 42.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই ‘খামর’ এবং সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।”[13]

মাদকাসক্তি: মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক অথবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী (মদ জাতীয় দ্রব্য) কোন ওষুধ কারণ ব্যতীত বার বার সেবন করে এবং উক্ত ঔষধের উপর শারীরিক অথবা মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[14] আরো একটু পরিস্কার করে বলা যায় যে, সব প্রাকৃতিক, রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদান স্নায়ুবিক উত্তেজনা, মানসিক প্রশান্তি, আনন্দ উদ্দীপকের সৃষ্টি করে যার ব্যবহারে ব্যক্তি নিজে ও পারিপার্শ্বিক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক চেতনা লোপ করে ব্যক্তির আচরণে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায় উক্ত দ্রব্য গ্রহণে ব্যক্তিকে বার বার প্ররোচিত করে এবং যার ওপর ব্যক্তির নির্ভরতার সৃষ্টি হয় তাকে মাদকাসক্তি বলে।[15]

---

[13] সুলাইমান ইবনু আল- আশ-আশ-আস, সুনান আবি দাউদ, (দেওবন্দ, আলমাকতাবাতু আল- আশরাফি সাহারানপুর, ইন্ডিয়া তা. বি) দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবু আল-আশারিয়া, পৃ. ৫১৮)।

[14] সৈয়দা ফিরোজা বেগম ও মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, “সামাজিক সমস্যা: স্বরূপ ও বিশ্লেষণ” ঢাকা: প্রফেসর প্রকাশন, নভেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ৭৬।

[15] মোঃ রেজাউল ইসলাম, বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে মাদকাসক্তি: একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৮, অক্টোবর-২০০০, পৃ. ১৭৩।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি: বাংলাদেশের মানুষ মাদকদ্রব্যের সাথে কম বেশী পরিচিত থাকলেও এদেশে মাদকাসক্তির ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায় স্বাধীনতা উত্তর সময়ে। অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান তিনটি আফিম ও আফিমজাত পণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চলের কাছাকাছি একটি দেশ হওয়ায় এবং প্রতিবেশী কয়েকটি দেশে বিপজ্জনক মাদকদ্রব্যের প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশকে গত প্রায় তিন দশক ধরে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের রুট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[16] সারা বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত পপির সিংহভাগই উৎপাদিত হয় এশিয়ার ৩টি প্রধান অঞ্চলে যথা: (১) থাইল্যান্ড, লাওস ও বার্মা-এই তিনটি দেশের সীমান্ত সংযোগ স্থলে যাকে গোল্ডের ট্রায়াঙ্গল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়; (২) পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্ককে নিয়ে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অঞ্চল এবং (৩) এ দুটি অঞ্চলের মর্ধবতী অঞ্চলে ভারত-নেপাল সীমান্ত জুড়ে গোল্ডেন ওয়েজ এলাকা।[17]

মূলত: পঞ্চাশের দশক থেকে অদ্যাবধি আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র বাংলাদেশকে মাদকাসক্তি চোরাচালানের করিডোর হিসাবে

---

[16] আলী হাসান, 'শতাব্দীর অভিশাপ ড্রাগাসক্তি: বিপন্ন তারুণ্য; মাসিক রোকসানা, আগষ্ট ১৯৮৮ খৃ. পৃ. ২২।

[17] অধ্যাপিকা বশিরা মান্নান, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি নিরাময়ে পরিবার ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন', (ঢাকা: বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য বিরোধী ফেডারেশন, ১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ২।

ব্যবহার করে আসছে।[18] বাংলাদেশকে মাদক পাচারের করিডোর হিসাবে বেছে নেবার পিছনে মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমটি বিশ্বের প্রধান মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো যেমন গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ওয়েজ বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী। তাছাড়া বাংলাদেশের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় কারণটি হলো, বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যাপক ব্যবহারে দীর্ঘদিন যাবত মুক্ত ছিল ফলে আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ সংস্থার কার্যাবলী ও তাদের সন্দেহের বাইরে থাকে। মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীরা ও সুযোগকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ হেরোইনের ব্যাপক চালান আসত বার্মা ও থাইল্যান্ড থেকে। কিন্তু ১৯৯০ এর পর থেকে পাকিস্তান ও ভারত থেকে সীমান্ত পথে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন ও মরফিন বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এ চোরাচালান ঘটছে জল, স্থল ও আকাশ পথে।[19]

১৯৮০ সাল পর্যন্ত হেরোইন নামক মাদকদ্রব্যটি বাংলাদেশে অপরিচিত ছিল।[20] অর্থাৎ ১৯৮২ সাল পর্যন্ত হেরোইনের নেশা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে বলে জানা যায় নি। এমনকি বলা হয়েছে

---

[18] মুহাম্মদ সামাদ, মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২, পৃ. ১৫০।

[19] অধ্যাপিকা বশিরা মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩।

[20] এ.বি.এম. রবিউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৯৮৩-৮৪ সালের আগে আমাদের দেশের কেউ হেরোইন চিনতো না। অথচ ব্যাপকভাবে হেরোইন চোরাচালান বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে তার বাজারজাত করণের ফলে ৮৫-৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশে নিয়মিত হেরোইনসেবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ৮৭-৯১ সাল পর্যন্ত বিশেষত তরুণ ছাত্র সমাজের মধ্যে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়।[21]

১৯১৭ সালে সমবায় ভিত্তিতে নওগাঁ জেলায় সর্বপ্রথম গাঁজার চাষ শুরু হয়। স্বাধীনতাপূর্ব কাল হতে বাংলাদেশে ছিল সীমিত সংখ্যক লাইসেন্সধারী আফিমসেবী। কিন্তু স্বাধীনতার পর গাঁজা ও মদের প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আশির দশকের গোড়ার দিকে হেরোইন বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে। পেথিডিনের ব্যবহারও বর্তমান দশকে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[22]

বর্তমান বাংলাদেশ: স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝেও এর দানবীয় বিস্তার দেশের বিবেকবান ও সচেতনদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। অবৈধ মাদকদ্রব্যের বিষাক্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ। শুধু অন্ধকারেই হারিয়ে যাচ্ছে না,

---

[21] অধ্যাপিকা বশিরা মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

[22] মোঃ আব্দুর রব মোল্লা ও মুহাম্মদ সাইফুল আলম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

বিষাক্ত মাদকদ্রব্য সেবন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অসংখ্য মানুষ। গত ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ৯৮) গাইবান্ধা জেলায় স্পিরিট পানে ৯৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। তা ছাড়া স্পিরিট পানে অসুস্থতার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫১ জন এবং পরবর্তীতে আরও ৪৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয় বলে জানা গেছে। ২০০০ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারী ফেনীতে বিষাক্ত রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে প্রায় ৫০ জন লোক মারা যায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে এখানেই মারা গিয়েছিল ৯ জন। পরবর্তীতে ঢাকার তেজগাঁও এর বেগুনবাড়ীতে ১২ জন মারা গিয়েছিল। এপর ১৯৯৯ সালেও নরসিংদী জেলায় যে রেক্টিফাইড স্পিরিট ট্রাজেডী ঘটেছিল তাতে শেষ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায়েছে ১২৬।

মাদারীপুর জেলার জেলখানা থেকে পতিতালয় সব জায়গায়ই জমজমাট মাদক ব্যবসা। অনুসন্ধানে জানা গেছে সদর উপজেলায় মাদকদ্রব্য বিক্রির ৫০টি স্পট রয়েছে। বরগুনা শহরের কমপক্ষে ৩০টি স্পটে প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকার হেরোইন ফেনসিডিল মদ, গাঁজা নেশাজাতীয় ইনজেকশন সবই বিক্রিয় হচ্ছে প্রকাশ্যে। শেরপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলে মাদকের ব্যবসা। বগুড়ার শিবগঞ্জে ও পাবনার ঈশ্বরদীতেও ফেনসিডিল ভয়াবহ আঘাত হেনেছে। সীমান্তবর্তী জেলা নাটোরের লালপুর, রাজশাহীর বাঘা ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় চোরাইপথে ফেনসিডিল নিয়ে আসার পর তা ঈশ্বরদীতে পাঠানো হয় এখানে থেকে ট্রেন, বাস, মাইক্রো ও প্রাইভেট গাড়িতে করে এগুলো যায়, ঢাকা, সাভার, নারায়নগঞ্জ,

গাজীপুর প্রভৃতি এলাকায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের প্রায় ২৫০টি ফেনসিডিল বিতরণ কেন্দ্র আছে।

যশোরের চৌগাছা ও বেনাপোল সীমান্তের বিভিন্ন চোরাপথ দিয়ে ফেনসিডিল পাচার হয়ে আসে। গত ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ২০০৪ ফেনসিডিলের দু'টি চালান আটক হয়েছে। এ নিয়ে ২ মাসে সেখানে অন্তত ৫০ হাজার বোতল ফেনসিডিল আটক হয়। পুলিশ বিডিআরের চোখ এড়িয়ে কি পরিমাণ ফেনসিডিল নেশাখোরদের হাতে চলে যাচ্ছে এ থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

শুধু রাজধানী শহর ঢাকার মাদকের প্রধান স্পট আছে ১০০০ টির মতো। খুচরা স্পটের সংখ্যা এ হাজারেরও বেশী। ঢাকায় মাদকের প্রধান স্পট ডেমরা থানাধীন ধলপুর বস্তি। বিশেষ করে বস্তায় বস্তায় ভারতীয় ফেনসিডিল এখানে আসে এবং অর্ডার অনুযায়ী এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। ঢাকার ৩ সহস্রাধিক বস্তিই মাদক বেচা-কেনার আখড়া। রাজধানীর মেট্রো পলিটন থানাগুলোর মধ্যে কাফরুল ও ক্যান্টনমেন্ট থানা ছাড়া বাকী সবগুলোই মাদকের রমরমা বাজারে পরিণত হয়েছে। চোরাই পথে বানের পানির মত মাদক আসছে এখানে। এর খুব সামান্য অংশই ধরা পড়ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে । গত ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আটককৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে, প্রায় ৬ লাখ ফেনসিডিল বোতল, ১৪৩ কেজি হেরোইন, ৪৩০ মন মন গাঁজা, ৭০,৬৫৩ লিটার তাড়ি, ২০,০৩৮ লিটার পেথিডিন

এবং ৩৮,৪২৩ লিটার রেক্টিফাইড স্পিরিট (দেখুন সারণী-১)। এ থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়, কি পরিমাণ মাদক বাংলাদেশে আসছে।

অর্থনীতির সূত্র ও মাদকদ্রব্যঃ প্রতিনিয়ত মানুষকে অসংখ্যা অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনীতিতে উপযোগ ও চাহিদার নীতি বিদ্যমান এবং এতে ন্যায়-অন্যায় এর প্রশ্ন জড়িত থাকে না। যে সকল মানুষের অভাব পুরণে সক্ষম তাদের উপযোগ ও চাহিদাও আছে। অর্থনীতির এ সূত্রটিকে পুঁজি করে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্র মানুষের অভ্যাসগত প্রয়োজনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে নানা কৌশলে মাদকদ্রব্যকে এমন পণ্যে রূপান্তরিক করেছে যেগুলো ছাড়া মানুষ চলতে অক্ষম। একবার এ দুষ্টচক্রে পা রাখলে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে নিজেকে ড্রাগনের হাতে সঁপে দিয়ে আর ফিরে আসার উপায় থাকে না।

চোরাচালান, বৈদেশিক মুদ্রা পাচার: মাদকাসক্তির সাথে চোরাকারবারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে যা দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্থ করে। এ ছাড়া দেশীয় মুদ্রা পাচারের সাথেও মাদকাসক্তির যোগসূত্র রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আফিমজাত মাদকদ্রব্য হেরোইনের চাহিদা বিপুল এবং দিনে দিনে এ চাহিদা বাড়ছে বৈ কমছে না। উৎপন্নকারী দেশগুলোর সাথে ব্যবহারকারী দেশগুলোতে মাদকদ্রব্যের মূল্যের রয়েছে আকাশ পাতাল তফাৎ। এ অঞ্চলে এক কেজি হেরোইনের দাম যেখানে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা

বা তারও কম, পশ্চিমা দেশগুলোতে এর দাম কোটি টাকা। এ বিপুল মুনাফা আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য চোরাচালানী সংগঠনগুলোকে করেছে আরো সুসংগঠিত আরো শক্তিশালী।[23] মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী দিবস ২৬ জুন, ২০০৫ পালন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স কক্ষে এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেন, দেশে ৬ হাজার কোটি টাকা মাদক ব্যবসা হচ্ছে। অথচ মূল হোতারা ধরাছোয়ার বাইরে থাকছে। ধরা পড়ছে খুচরা মাদক বিক্রেতা কিংবা মাদকসেবীরা।[24]

মাদকাসক্তির ফলে মাদকদ্রব্যসহ অন্যান্য চোরাচালানও বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি বছর প্রচুর টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যায়। সরকার বঞ্চিত হয় শুল্ক হতে। একটি তথ্যে জানা যায়, আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসাযী ও চোরাচালানকারীরা বাংলাদেশের নেশার বাজার থেকে প্রতিবছর কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।[25] ফলে দেশের অর্থনীতিকে বড় ধরনের ক্ষতি ও প্রতিকুলতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

---

[23] খ.ম. আমিনুল ইসলাম, বিচ্যুতি ও অপরাধ, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ মার্চ-২০০৫, পৃ. ১২১।

[24] প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৫, পৃ. ১।

[25] এম. ইমদাদুল হক, মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, ছায়া প্রশাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৫।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট: স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি একধাপ এগিয়ে গেলে দুই ধাপ পিছিয়ে আসে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ক্ষুদ্র এ রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে সমানভাবে এগুতে পারছে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে রয়েছে বড় ধরনের ব্যবধান। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সাথে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ঠিক এ অবস্থায় ভারত থেকে প্রতিদিন চোরাই পথে আসছে কোটি কোটি টাকার ফেনসিডিল এবং পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশীয় সম্পদ। সীমান্তের ফাঁক গলিয়ে প্রতিদিন অন্তত ১০ লাখ বোতল ফেনসিডিল আসে এখানে।[26] প্রতি বোতল ফেনসিডিল বোতলের দাম ২০০ টাকা[27] ধরলে প্রতিদিন খরচ হয় ২০ কোটি টাকা, বাৎসরিক হিসাবে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ হাজার ৩শত কোটি টাকা। এভাবে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের কবলে পড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

---

[26] দৈনিক সংগ্রাম, ২৭ অক্টোবর, ২০০৪, পৃ. ৩।

[27] এটি সর্বনিম্ন রেট, প্রতি বোতল ফেনসিডিল বিক্রি হয় ১৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ অক্টোবর, ২০০৪, পৃ. ৩। আবার বরগুনা শহরে বিক্রি হয় বোতল প্রতি ২২৫ টাকা থেকে ২৫০ টাকায়। দেখুন প্রথম আলো, ২৬ জুন, ২০০৫, পৃ. ৪। বর্তমানে প্রতিবোতল ফেনসিডিলের দাম তার চাইতে অনেক বেশী।

দেশে চোরাই পথে মালামাল আসলে যেমন সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা এতে সরকার কর ও টেক্স থেকে বঞ্চিত হয় এবং সরকারের সুনির্দিষ্ট আমদানী ও রপ্তানী বাধাগ্রস্ত হয়। এর সাথে দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়ে গেলে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে সরকারকে বিপাকে পড়তে হয়।

চিকিৎসাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি: মাদকদ্রব্য সেব শারীরিকভাবে আসক্তদের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। দীর্ঘদিন ড্রাগ ব্যবহারের ফলে আসক্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস,[28] স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্রাঙ্কাইটিস, অন্ত্রের ঘা, যৌন অপারগতা, সন্তান উৎপাদনের অক্ষমতা, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নিলে এইডস, হেপাটাইসিস 'এ' ও 'বি' সহ বিভিন্ন রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।[29] ক্রমাগত হারে এদের রোগ-ব্যাধি বাড়তেই থাকে। এদের রোগ-ব্যাধি বেশী হয় ও স্বাস্থ্যহীনতা ঘটে।

---

[28] জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক কর্মসূচি (UNDCP), মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন, ঢাকা: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ২; বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর এবং UNDCP -এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত, জীবন একটাই সুন্দরভাবে বাঁচার নামই জীবন, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৪।

[29] জাতিসংঘ অন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (UNDCP), মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২।

ফলে এদের পেছনে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যয়ও কম হয় না, যা জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।[30]

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ফলে অকর্মণ্য যুবক ও যুবতীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। জটিল ও কঠিন রোগে ভোগের ফলে এদের চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায়। মাদকাসক্ত কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যখাতে যা ব্যয়, তা গড়পড়তা খরচের চেয়ে বেশি।[31] তাছাড়া মাদকাসক্ত ছেলে সন্তানদের চিকিৎসা করাতে অভিভাবকদের গুনতে হয় বাড়তি টাকা। ঢাকা শহরে প্রাইভেট ক্লিনিকে রেখে চিকিৎসা করাতে রোগী প্রতি খরচ পড়ে মাসিক ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।[32] এক হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যয় দাঁড়ায় বার্ষিক প্রায় দুই শত কোটি টাকা।

মাদকাসক্তদের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যধি এইডস এর ভয়াবহ প্রকোপ দেখা যায়। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, এইডস আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ হচ্ছে শিরার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারী। বর্তমানে দেশে প্রায় ৫ লাখ এইচআইভি জীবাণুবাহী নারী-পুরুষ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন

---

[30] মোঃ রেজাউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

[31] কাজী আলী রেজা (সম্পাদিত), জাতিসংঘ এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[32] অধ্যাপিকা বশিরা মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

এইডস রোগীর কথাই সরকার স্বীকার করে এবং ২০০৮ সাল পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ১৬৫ জন। অবশ্য ওয়াকিবহাল একাধিক সূত্র জানায়, দেশের এইডস রোগীর সংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে।[33] সাধারণ রোগীর পাশাপাশি এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এভাবে বাড়ার ফলে দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে সচেতন মহলের মধ্যে রীতিমত আতংক দেখা দিয়েছে।

আর্থিক দেউলিয়াপনা বৃদ্ধি: একজন নিয়মিত মাদকসেবীর চাহিদার প্রথমেই থাকে মাদক। যদি সে রিক্সা চালক হয়, তাহলে প্রথমেই তার মাদকের প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে বাকীটা অন্যান্য খাতে খরচ করবে। যদি রোজগার কম হয়, তাহলে ভাত-পানি না খেয়ে মাদক সেবন করবে। এভাবে মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক দিককে ক্রমাবনতির দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পঙ্গু করে দেয়। মদখোর যখন সব সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে, তখন আন্তরিক দারিদ্রতায় ও অবস্থানিক দরিদ্রতায় নিপতিত হয়। তার জীবন পর্যুদস্ত দরিদ্র ও রাস্তায় পড়া ভিক্ষুকের ন্যায় হয়ে যায়। তার পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, নিঃস্ব হয়ে পড়ে।[34] পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতিজন মাদকাসক্ত গড়ে মাসে প্রায় ৪০০০ টাকা খরচ

---

[33] দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ অক্টোবর, ২০০৪, পৃ. ৩।

[34] আল-জাযীরী: কিতাব আল-ফিকহ আলা-মাযাহিব আল-আরবা'আ, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা ১৩৯৩, হি. ৫ম খ., পৃ. ২৭।

করে।[35] বাংলাদেশে ফেনসিডিল বোতল প্রতি বিক্রি হয় ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা। হেরোইন এক পুরিয়ার দাম ১০০ থেকে ১২৫ টাকা।[36] ক্লায়েন্ট মনিটরিং সিস্টেমে পরিচালিত সহকারী এক জরিপে জানা গেছে, প্রতিজন মাদকাসক্ত গড়ে মাসে প্রায় ৪ হাজার টাকা খরচ করে।[37] দেশে নূন্যতম ৫০ লাখ মাদকাসক্ত ধরলেও এ রাষ্ট্রে মাদক ব্যবহার বাবদ মাসিক মোট ব্যয় দাঁড়ায় ২ হাজার কোটি টাকা। বছরে ব্যয় হয় ২৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থ অপচয়ের এ রাস্তা ধরে প্রতি বছর অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আশংকাজনকহারে বেড়েই চলেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে অধিক ব্যয়ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তখনই বলা হয় যখন দেশের জনগণের মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পায়। জিডিপি তখনই বৃদ্ধি পায় যখন দেশের প্রত্যেকটি মানুষ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবদান রাখে। মাদকাসক্তির ফলে জনগণের একটি বিরাট অংশ অর্থনীতিকে এগিয়ে নেবার বদলে পিছনের দিকে টেনে ধরছে। দারিদ্র্যের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মাদকাসক্তের উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস পায় বা কখনও

---

[35] খুশী মোহন বিশ্বাস, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর নিয়ন্ত্রণে অভিভাবকদের ভূমিকা (ঢাকা: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-০৮ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনির), পৃ. ৪৮; মে রেজাউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

[36] দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ অক্টোবর, ২০০৪, পৃ. ৩।

[37] দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ অক্টোবর, ২০০৪, পৃ. ৩।

কখনও উপার্জনক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে বলে তার পক্ষে পরিবারের মৌল মানসিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণে সমস্যা হয়। মাদকাসক্ত পরিবার চরম অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্বিক সমস্যার নিপতিত হতে পারে।[38]

মদ্যপায়ীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ তার আর্থিক দিক। অব্যাহতভাবে মদ্যপান করতে' প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এর ফলে সংসার জীবনে আসে দুঃখ দুর্দশা। বেড়ে যায় ঋণের বোঝা।[39] মদপান করা ক্রয় ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। জীবনের সকল আয়-রোযগার, পরিশেষে দোকানপাট বিক্রি করে ও কৃষিসম্পদ হারিয়ে ফেলে। সকল বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে সম্পদ হারায় ও দরিদ্রতা ডেকে আনে।[40] সহায়-সম্বল হারিয়ে ব্যক্তি ও পরিবার হয়ে পড়ে অসহায়। এ সব দরিদ্রদের জন্য সরকারকে খরচ কতে হয় বাড়তি টাকা। বাৎসরিক বাজেটে দারিদ্র্য বিমোচন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে বরাদ্দ নিতে হয় হাজার হাজার কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ সালে বাজেটে এ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে বরাদ্দ

---

[38] মোঃ রেজাউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

[39] মোঃ শামছুল আলম ও মোঃ জহিরুল ইসলাম, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬, পৃ. ৯৬।

[40] ড. ফখরী আহমদ ওকাজ, ফালসাফাতুল ওকুবাত, জেদ্দাহ: মাকাতাবাতু ওকাজ, ১৮০২ হি. পৃ. ১০১।

ছিল মোট জিডিপির ৯.৫ শতাংশ।[41] অর্থাৎ প্রায় ৫০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সরকারকে বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পুর্নবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারকে বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পুনর্বাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও **রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত:** উন্নয়ন হলো ব্যক্তি ও সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি চলমান জটিল প্রক্রিয়া। এ অগ্রগতির ফলে সকল ক্ষেত্রে আসে গতি এবং অনগ্রসরতার ফলে সব কিছু হয়ে পড়ে স্থবির। জনশক্তি একটি দেশের জাতীয় সম্পদ। এর কোন বিকল্প নেই। জাতির মূল চালিকাশক্তি হলো যুবসমাজ। কিন্তু আজ ও যুবসমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল জনগোষ্ঠী পরিচিত হচ্ছে হরেক রকম মাদকদ্রব্যের সাথে। জড়িয়ে পড়ছে মাদকের মায়াজালে। ধ্বংস হচ্ছে যুব সমাজ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। রসাতলে যাচ্ছে মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

[41] দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুন, ২০০৮ (অর্থ উপদেষ্টার বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণী), পৃ. ৫।

সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির পাশাপাশি দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর উপরও মাদকদ্রব্য তার ভয়াবহ ছোবল প্রসারিত করেছে। মাদকের কবলে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার প্রতি যেমন বিমুখ হচ্ছে, তেমনি নেশার টাকা যোগাড় করতে অনেক ক্ষেত্রে তারা আবার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে।[42] ফলে শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছে বন্ধুদের সাথে নেশা আখড়ায়। এক সময় নেশা করাই হয়ে উঠে প্রধান লক্ষ্য। অকালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হারিয়ে যায় নেশার নীল দরিয়ায়। এভাবে নষ্ট হচ্ছে অসংখ্য মেধা এবং দেশ এগিয়ে চলেছে মেধাশূন্যতার দিকে।

এদেশের ৮৫% মাদকাসক্তের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ৯৯% হলো পুরুষ এবং ৫৫% অবিবাহিতরা বেশী মাদক সেবনে অভ্যস্ত।[43] মাদকদ্রব্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হচ্ছে এটি সমাজের তরুণ সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে সর্বাধিক। ফলে সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তরুণরা মাদকদ্রব্যের ছোবলে পড়ে আয়-রোযগারের ক্ষেত্রে এবং নিজ জীবনের ক্ষেত্রেও উদাসীন থাকে। তা ছাড়া তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটার কারণে ও শক্তিহীনতার ফলে

---

[42] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, ঢাকা, তাসলিমা পাবলিকেশন্স, জুলাই-২০০৪, পৃ. ১৯৩।

[43] খুশী মোহন বিশ্বাস, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর নিয়ন্ত্রণে অভিভাবকের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।[44] মাদকাসক্ত ব্যক্তি ওজনহীনতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষুধামন্দায় ভোগে। এদের কর্মোদ্দীপনা হ্রাস পায়, মতিভ্রম দেখা দেয় এবং এরা ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহীন ও কংকালসার হয়ে পড়ে।[45] অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে যখন মদখোর এর বয়স চল্লিশ বছর হয়, তখন তাকে ষাট বছরের দুর্বল মানুষের মত করে তোলে। তার শরীর হালকা হয়ে যায়। তার সমবয়সী ষাট বছরের লোকেরা এতখানি দুর্বল হয় না।[46] দেশে ন্যূনতম এক লাখ মাদকাসক্ত কর্মদক্ষতা হারিয়ে অকর্মন্য হয়ে থাকলে এবং এদের মাসিক আয় গড়ে ন্যূনতম ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকা ধরলে বাৎসরিক এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০০০ কোটি টাকা। আর এদেরকে যদি রপ্তানী করা যেত তাহলে এদের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াতো ১২০০ থেকে ১৩০০ কোটি টাকা।

আইন-শৃঙ্খলা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি: মাদকাসক্তির সঙ্গে রয়েছে অপরাধের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মাদকাসক্তির ফলে যুবশ্রেণীর মধ্যে সৎগুণ বিলুপ্ত হয়। সন্ত্রস, অস্ত্রবাজি ও অপরাধপ্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সীমিত সংখ্যক লোকবল ও অস্ত্রবল নিয়ে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হিমসিম খাচ্ছে। তার

---

[44] এম. ইমদাদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

[45] মোঃ রেজাউল ইসলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

[46] সাইয়িদ সাবিক, ফিকহ আল সুন্নাহ, ২য় খন্ড, বৈরুত: দারুল ফিকহ, ১৯৯২, পৃ. ৪৯৬।

উপর মাদকাসক্তি সৃষ্ট অপরাধ দমন এবং এদের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক কর্মকান্ডে দারুন ব্যাঘাত ঘটায়। বিশেষ করে ঢাকা শহরে হেরোইনখোরদের উৎপাত আশংকাজন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় জনগণ, বাসা-বাড়ির লোকজন এদের অত্যাচারে নিকট অসহায়।

মাদকাসক্তি ও মাদকব্যবসা কতটা ভয়ংকর ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে থাকে তা দৈনিক ইত্তেফাকের একটি রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে, রিপোর্টটিতে বলা হয়, মাদকের ডিপো আমিন বাজার (ঢাকা), এক যুগে র‍্যাব পুলিশসহ খুন হয়েছে অর্ধশত। ১৯৯৬ সালের ৯ আগষ্ট ফেনসিডিল ব্যবসায়ীদের সাথে এলাকাবাসীর সংঘর্ষে ৫০ জন আহত।

একই সালের ১৮ নভেম্বর ১ পুলিশ সহ ৬ জন গুলিবিদ্ধ ও ১৬ ডিসেম্বর রাতে মাদক ব্যবসায়ী দুই গ্রুপের ৩ জন গুলিবিদ্ধ। ১৯৯৭ সালের ৬ জানুয়ারী ১ পুলিশ কনষ্টেবল ছুরিকাহত। ১৯৯৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মাদক ব্যবসায়ীরা আমিন বাজার পুলিশ ফাড়িতে হামলা চালালে আহত হয় পুলিশ ইন্সপেক্টর শাহজাহান আলী। ২০০২ সালে এরা সাভার থানার এস আই কে গুলি করে হত্যা করে। ২০০৩ সালে ২ পুলিশ ও ৬ সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয়। ২০০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর র‍্যাব সদস্যরা আমিন বাজারে ফেনসিডিল ও অস্ত্রের চালান আটক করতে গেলে উভয়ের মাঝে গুলি বিনিময়ে র‍্যাবের এক সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়। সর্বশেষ ৩ মার্চ

২০০৭ আমিনবাজার এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সালেহপুরে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে র‌্যাবের দুই সদস্যকে।[47]

মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহারজনিত সকল কর্মতৎপরতা অবৈধ ও আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। সারাদেশে এহেন কাজের সাথে জড়িত লোকজন ধরা পড়ছে প্রতিনিয়ত। এদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা হয়। এ মামলার সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে সৃষ্টি হচ্ছে মামলাজট। বাধ্য হয়ে আদালতের সংখ্যা বাড়াতে হয় এবং নিয়োগ করতে হয় অতিরিক্ত লোকবল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে দেয়া এক তথ্যে জানা যায় ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ৬৫০৬৬ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং এ সময়ে আসামীর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৭১৭৯৮ জনে। (দেখুন সারণী-২)। প্রতি বছরে গড়ে মামলা দাঁড়ায় ৫৯১৫ টি এবং আসামীর সাংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৬৫২৭ জনে। মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৪৩৯০টি।[48] মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা ১৯৯০ এর ধারা ১৯ এ মাদক আইনে গ্রেফতারকৃতদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এতে কারাভোগের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ বৎসর থেকে ১৫ বৎসর কারাভোগের কথা বলা হয়েছে। ধৃত আসামীদের

---

[47] দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মার্চ, ২০০৭, পৃ. ১ ও ৪।

[48] মোঃ হুমায়ুন কবির, মাদক বিরোধী কার্যক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভূমিকা, (ঢাকা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' ০৮ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনির), পৃ. ৪৮।

মামলা পরিচালনা ও কারাগারে রেখে তাদের খাওয়া, পোশাক-আশাক, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ প্রতিবছর সরকারের ব্যয় দাঁড়ায় ন্যূনতম ৫০ কোটি টাকা। এছাড়া এদেরকে দমন ও নিয়ন্ত্রণে সরকারকে পোহাতে হয় বাড়তি টেনশন। সঙ্গত কারণেই এসব কর্মকাণ্ডে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়।

কালো টাকার আধিক্য ও মুদ্রাস্ফীতি: অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা বা চোরাচালান বর্তমান সময়ে দ্রুত ধনী হওয়ার সহজতম পথ। মাদকদ্রব্য পাচারের বদৌলতে এ ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোটি ডলারের মালিক হয়েছে অনেকেই।[49] এ অবৈধ অর্থ ভাণ্ডারের দুর্নীতিময় প্রভাব সমাজের সকল স্তরে লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে এই প্রভাব যথেষ্ট লক্ষণীয়। যেহেতু প্রধান মাদকদ্রব্য পাচারকারীদের হাতে মাত্রাহীন অর্থ মজুদ থাকে, সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদানের ব্যয়কে তারা তাই সঠিক ক্ষেত্রে অর্থলগ্নি হিসেবেই গণ্য করে থাকে। তাদের কর্মকাণ্ড কেবল এখানেই সীমিত থাকে না। ভোটকে প্রভাবিত করতে, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, বিচারক অথবা আইন প্রয়োগকারীদের 'ক্রয়' করতে, আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের কার্যকারিতাকে প্রভাবান্বিত করতে মাদকদ্রব্য

---

[49] মুহাম্মদ সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

পাচারকারীর অবাধে মাদক ডলার ব্যয় করতে থাকে।[50] এভাবে এরা দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে জাতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশসমূহে সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সহায়তার 'কালো টাকা'র মালিকরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভোটকে প্রভাবিত করা তথা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।[51] মাদক পাচারে কোটি কোটি টাকা লভ্যাংশ পাওয়ার ফলে অনেক সময় প্রশাসনিক দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে মাদকের সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে চোরাচালান বৃদ্ধি পায়। আবার এর মাধ্যমে অনেকে কালো টাকার মালিক হয়ে টাকার অপব্যবহার করে।[52] সমাজের দুষ্ট কিছু লোক মাদকের অবৈধ পাচার ও ব্যবসার মাধ্যমে টাকার পাহাড় গড়ে তুলে। কিছু হাতে টাকা কুক্ষিগত হলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়।

---

[50] কাজী আলী রেজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

[51] প্রাগুক্ত।

[52] মোঃ রেজাউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

মানবীয় ব্যবস্থাপনায় মাদক নির্মূলের কৌশলপত্র ও এর কার্যকারিতা

আন্তর্জাতিক: (ক) আফিম কমিশন এবং দি হেগ কনভেনশন (১৯০৯) (খ) লীগ অব নেশনস (১৯২০): এ লীগের ছত্রছায়ায় তিনটি মূল কনভেনশনের সৃষ্টি হয়েছিল। যাদের লক্ষ্য ছিল আফিম সেবন রোধ করা।[53]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে জাতিসংঘের ভূমিকা

(ক) ১৯৪৬-এর প্রটোকল, (খ) ১৯৪৮-এর প্রটোকল (গ) ১৯৫৩-এর প্রটোকল: যা ১৯৬৩ সালের ৮ মার্চ কার্যকর হয়। (ঘ) মাদকদ্রব্য বিষয়ক একক কনভেনশন, ১৯৬১ (ঙ) একক কনভেনশন সংশোধন করে ১৯৭২-এর প্রটোকল। (চ) মানসিক অবস্থান পরিবর্তন সৃষ্টিকারী দ্রব্যাদি বিষয়ক কনভেনশন, ১৯৭১। (ছ) আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ১৯৮১। (জ) মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ১৯৮৪ সালের ঘোষণা। (ঝ) মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও চোরাচালান সংক্রান্ত ১৯৮৭ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। (ঞ) নেশাকারী মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের বিরুদ্ধ জাতিসংঘ কনভেনশন।[54]

---

[53] কাজী আলী রেজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

[54] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৯৫।

বাংলাদেশ: (ক) ১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধ নীতি, (খ) ১৯৮৪ সালে আফিম এবং মদের বিকল্প হিসাবে বহুল ব্যবহৃত মৃত সঞ্জীবনী সূরা নিষিদ্ধকরণ; (গ) ১৯৮৭ সালে গাঁজার চাষ বন্ধ করা এবং ১৯৮৯ সালে সমস্ত গাঁজার দোকান তুলে দেয়া। (ঘ) “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০” প্রণয়ন।[55]

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপর্যুক্ত আইন ও বিভিন্ন শাস্তির বিধান করে মাদকাসক্তি নির্মূল করাতো দূরের কথা বরং তার গতিকে একটুও কমানো যায় নি। কিন্তু আল-কুরআনের দেয়া বিজ্ঞানিক ফর্মূলা এমন এক জাতিকে মাদকমুক্ত করেছিল যে জাতি ছিল ১০০% মাদকাসক্ত। মাদকাসক্ত করণে আল-কুরআনের কৌশল পত্রটি নিম্নরূপ:

মাদকতা নির্মূলে আল-কুরআন

1) মাদক নিষিদ্ধকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আল্লাহর দেওয়া বিভিন্ন নেয়ামত থেকে মানুষ কিভাবে উপকৃত হয়ে থাকে তা তুলে ধরা হয়েছে[56] কিন্তু ইঙ্গিতে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মদ পবিত্র রিযিক রূপে গণ্য হতে পারে না তাই তা

---

[55]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

[56] দেখুন আল-কুরআন, সুরা নাহল, আয়াত ৬৭।

নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মদের প্রতি ঘৃণার বীজ লোকদের মনে বপন করাই ছিল এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য।[57]

2) দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াতটিতে বলা হয়েছে, এতে বড় গুনাহ্ রয়েছে, উপকারও আছে বটে। তবে উপকারের তুলনায় গুনাহ অনেক বড়।[58] এতে মদ্যপানের দরুন যে সব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। মদ্যপান হারাম করা হয়নি, বরং এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যায় যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোনো নির্দেশ এতে দেয়া হয়নি।[59] তবে এই আয়াত নাযিলের পর কেউ কেউ মদ পান করতো, আবার কেউ কেউ ছেড়ে দিলেন।[60]

3) উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলো। তারপর কিছু কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ নামাযের সময়ে মদ পান নিষিদ্ধ করা হল[61], ফলে একদল

---

[57] মাওলানা আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশীন, ১৯৯৭), পৃ. ২৪২-২৪৩)

[58] দেখুন আল-কুরআন, সুরা আল বাকারা, আয়াত ২১৯।

[59] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাসীরে মা আরেফুল-কোরআন, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫৮৩-৮৪।

[60] ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী, ২০০৬), পৃ. ৪৫২।

[61] দেখুন আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, আয়াত ৪৩।

তা সব সময়ের জন্য বর্জন করল। অন্য একদল সালের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পান করতে থাকলেন।[62]

4) চতুর্থ পর্যায়ে মদকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হলো।[63]

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালামও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি বলেন:

- সকল নেশার জিনিসই মাদক এবং সকল নেশার জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি মাদকে মাতাল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে পরকালের পানীয় পান করতে পারবে না।[64]
- সব নেশার জিনিসই হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তার পূর্ণ অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।[65]

---

[62] আবু তাইয়্যেব সিদ্দিক ইবনে হাসান, ফাতহু আল-বয়ান ফি মাকাসিদি আল-কুরআন, (বাইরুত: লেবাবন: দারু আল-ফিতাব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯), ২য় খন্ড, পৃ. ৩১০।

[63] দেখুন, আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০-৯১।

[64] সুলাইমান ইবনু আল-আশআস, সুনানু আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮। হাদীস নং ৩৬৭৯।

[65] সুলাইমান ইবনু আল-আশ'আস, সুনানু আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯। হাদীস নং ৩৬৮১।

- যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, সে পরকালে পানীয় পান করতে পারবে না।[66]
- মদ সকল অপবিত্রতার মূল।[67]
- অন্য বর্ণনায় আছে, মদ সব অশ্লীল কাজের মূল এবং সবচাইতে বড় গুনাহের কাজ। যে মদ খায় সে সালাত বর্জন করে, আর সে যেন তার মা, খালা ও ফুফীর সম্ভ্রম হানি করে।[68]

মাদক নিষিদ্ধকরণে ক্রমধারা অবলম্বন: মাদক নিষিদ্ধকরণে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা, বিশেষত নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হত। এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। দ্বীন ইসলাম যখন নাযিল হচ্ছিল, তখন মদ সমগ্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এই মারাত্মক অভ্যাসজনিত কাজটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম

---

[66] মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৬। হাদীস নং ৫৫৭৫।

[67] সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ৫৬৬৬; ৫৬৬৭। তবে উসমান রা. থেকে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত।

[68] দারা কুতনী, হাদীস নং ৪৬১২; দুর্বল সনদে।

ঘোষণা করতে বিজ্ঞানসম্মত ক্রমিক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা এই জিনিসটিকে তখন যদি হঠাৎ করে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হত, তাহলে তা পালন করা তখনকার লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত। অনেকে হয়ত তা গ্রাহ্যই করত না।[69]

শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরিয়ত কোনো বিষয়ে কোনো হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়।[70] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আল্লাহ কোনো মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে।[71] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কুরআন মাজীদের প্রথম দিকে অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসমূহে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। তা গ্রহণ করে লোকেরা যখন ইসলামের দিকে ফিরে এল, তারপরে হালাল হারামের বিধান অবতীর্ণ হল। এ না হয়ে প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই

---

[69] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

[70] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩।

[71] আল-কুরআন, সূরা বাক্বারা, আয়াত ২৮৬।

যদি বলা হত, তোমরা মদ্যপান করো না, তাহলে তারা অবশ্যই বলতো, আমরা কক্ষণই মদ্যপান ত্যাগ করবো না।[72]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবী সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে: হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোট স্পর্শ করেছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং

[72] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।[73]

মাদকাসক্তি নিবারণে আল-কুরআনের দর্শন: মদ্যপান থেকে বিরত রাখার জন্য প্রথমত মানসিক ও নৈতিকভাবে সংস্কার সাধন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরকালের শাস্তির কথা কঠোর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম; মদখোর, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং দায়ূছ।[74] এমনিভাবে বিভিন্ন ভাষায় মদ্যপান থেকে বিরত রাখতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তারপরও যারা এহেন ঘৃণ্য কাজে জড়িত হবে তাদের জন্য ইহকালীন শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

মদকে হারাম করার পেছনে হেকমত হল, মুসলিমের দ্বীন, বিবেক, দৈহিক শক্তি ও সম্পদকে নিরাপদ রাখা।[75] বিবেক হলো মানুষের মুকুট, ভাল-মন্দ, পবিত্র ও অপবিত্রতার মধ্যে পার্থক্য করার ভিত্তি। অনুরূপভাবে মদের নিষিদ্ধতা ইসলামী শিক্ষাসমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যা ব্যক্তি ও সামাজিক চরিত্র গঠনে এবং উন্নত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের লক্ষ্য বস্তু হিসেবে কাজ করে।

---

[73] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫।

[74] কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথী (র), তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩।

[75] আবু বকর জাবের আল-জায়ায়িবী, মিনহাজুল মুসলিম (জিদ্দাহ: দারু আল-শুরূক, দশম সংস্করণ, ১৯৯০), পৃ. ৬৬৫।

নিঃসন্দেহে মদ চরিত্রকে দুর্বল, ব্যক্তিকে ধ্বংস, কাঠামোকে হরণকারী বিশেষ করে বিবেককে ধ্বংস করে দেয়।[76] মানুষের বিবেক চলে গেলে সে নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত হয়। তার থেকে বিশৃংখলা, অশ্লীলতা, গোপনীয়তা প্রকাশ, মারাত্মকভাবে সব অসৎ চরিত্র প্রকাশিত হয়। সুতরাং হত্যা, শত্রুতা, অশ্লীলতা, দেশের খেয়ানত মদ পান থেকে হয়ে থাকে।

ইসলামে মদকে নিষিদ্ধ হওয়ার আলোচিত বিষয়টি এক অনুপম নীতি। আমরা উপরে দেখেছি, মাদকাসক্তিকে নিষিদ্ধ করতে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে। শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে বিশেষ কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হয় নি। খোদ আমেরিকার মত দেশেও আইনের দ্বারা মাদকতা নিবারণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে কিসের বলে ইসলাম সহজ ও সাবলীলভাবে আকণ্ঠ মাদকাসক্ত একটি জাতিকে মাদকমুক্ত করেছিল?

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যে, ইসলামী শরিয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করে নি, বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ইবাদত-

---

[76] ‘আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাববারা, আল-খাতাইয়া ফি নযরিল ইসলাম(বৈরুত: লেবানন, দারুল ইলম লিল মালাইন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৩ ইং), ৭ম খন্ড, পৃ. ১০৭-১১১।

আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা দিয়ে পরিবর্তন সাধন করে। আল্লাহ-ভীতি অর্জনে সহযোগিতা করে। যার ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি মাত্র আহ্বানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকাত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। পক্ষান্তরে মন পরিবর্তন করার জন্য আমেরিকা সহ সকল রাষ্ট্রসমূহে অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু একটি জিনিস নেই তা হল পরকালের চিন্তা।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে করণীয়

মাদকদ্রব্যের ভয়ংকর ও বিধ্বংসী আক্রমণ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে দেশের জনগণ, সরকার ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের করণীয় হচ্ছে:

1. শিশুকাল থেকেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে; যাতে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ পালনে আগ্রহী হয়। মহান আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা তৈরী করতে হবে; যাতে আল্লাহর প্রতিটি কথা পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মদ ও এর পানকারী এবং যে পান করায়, এর বিক্রেতা ও ক্রেতা, এর রস গ্রহণকারী ও রস যোগানদানকারী, সরবরাহকারী ও যার

নিকট সরবরাহ করা হয় সবার উপরই লা'নত করেছেন।[77] মাদকদ্রব্যের ব্যবসা হারাম। ইত্যাদি বিষয়সহ মাদকের ইহকালীন ক্ষতি ও পরকালীন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, মসজিদের ইমাম সাহেব, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজ কর্মীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন।

2. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রবন্ধ, ফিচার, গল্প ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমানে পাঠ্যসূচীতে যতটুকু বিদ্যমান আছে তা খুবই সামান্য। মাদক সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আরো বিস্তারিত আকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাদকাসক্তি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে ডাটা সংগ্রহ করা ও গবেষণা করার সুযোগ দিতে হবে।
3. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে সরকারকে উদার হস্তে সহযোগিতা করতে হবে। যেমন, এ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা, গণসচেতনতা সৃষ্টি, প্রদর্শনী প্রোগ্রাম, সেমিনার, আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ, মাদক বিরোধী অভিযান ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করা।
4. মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ ক্ষতি যেমন, শারীরিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরে সচেতনতা

---

[77] সুলাইমান ইবনু আল-আশ'আস, সুনানু আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭।

সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকতেই মাদকাসক্তির শারীরিক ক্ষতির দিকটি বুঝাতে হবে। কেননা প্রথম মাদক গ্রহণ কালে অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন থাকে না। তাহলে সমাজের প্রতিটি মানুষ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ বেচা-কেনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবে।

5. প্রচলিত আইনে মাদক সংক্রান্ত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। দোষী সাব্যস্ত হলে এ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে পরবর্তীতে আর কেউ এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে, সহযোগিতা বা মদদ যোগাতে সাহস না করে। এ শাস্তির বিষয়টি জাতীয় প্রচার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে হবে এবং মাদকদ্রব্যের প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।
6. সরকারী উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশ মাদক চোরাচালানের আন্তর্জাতিক রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং চোরাচালানকারী রাষ্ট্রসমূহ সবগুলোই প্রায় সার্ক সদস্যভূক্ত, সেহেতু এ ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলোচনা করে চোরাচালান রোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
7. মাদকদ্রব্যের চোরাচালান, বিক্রয়, বিপনন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার ও সরকারী সংস্থা যেমন পুলিশ, বি.ডি.আর, আইন বিভাগকে আরো বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন

কোন ক্ষেত্রে মাদক চোরাচালান ও সরবরাহে পুলিশ বিভাগের সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। সে ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হলে তাৎক্ষনিক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

8. অভিভাবকদের আরো সচেতন হতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েরা পাড়ার বা মহল্লার বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে আড্ডা না দেয়। কেননা বখাটে বন্ধুদের খপ্পরে পড়েই প্রথম মাদক গ্রহণ করে থাকে।

9. প্রচার মাধ্যমে মাদকাসক্তির কুফল আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। এইডস, ডাইরিয়া প্রতিরোধে ইত্যাদির মত এর বিরুদ্ধেও বিজ্ঞাপন ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এ ব্যাপারেও একটি ব্যাপক সচেতনতা ও গণপ্রতিরোধের পরিবেশ গড়ে উঠে।

10. দেশে চোরাচালানের সম্ভাব্য পয়েন্টগুলোতে চোরাচালান রোধের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটানোসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ মাদকাসক্তি নিবারণে বার বার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কিন্তু বরাবরের মতই তা কোনো কাজে আসেনি। এক নাগাড়ে মাদক তার কালো হিংস্র থাবা বিস্তার করেই যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত মাদকের মায়াজালে আটকে ধ্বংস হচ্ছে জাতি ও সমাজ। অর্থনৈতিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছে দেশের অর্থনীতি; মাদকাসক্তির এহেন বিধ্বংসী দাবানল থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা আপাত একটিই, সেটি হচ্ছে আল-কুরআনের আইন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকাসক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ। সরকারী ও বেসরকারী সকল উদ্যোগকে সমন্বিত করে একটি পরিকল্পিত ও বাস্তবমুখী আন্তরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের শ্রেষ্ঠ দাবী।

পরিশিষ্ট

সারণী-১ : গত ২০০০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সমগ্র দেশব্যাপী আটককৃত প্রধান প্রধান মাদকের বিবরণী

বছর	ফেনসিডিল (বোতল)	হেরোইন (কেজি)	জাওয়া (লিটার)	গাঁজা (কেজি)	গাঁজা (গাছ)	তাড়ি (লিটার)	পেথিডিন (এম্পুল)	রেক্টিস্পিরিট (লিটার)
২০০০	৬১২৩৬	৪.০৩১	৭৫২৩৪.০৬	২৬৫৭.৮৯৯	১৮৪০	৫১৪১.৫	১১৭৫	৪৯৮৮.৫৪৫
২০০১	৮২৪৬৭	১৩.৭৫৩	৮২২৭৩	২০৫৭.১৮৭	১০২৯৩	৫২২৭.৮০০	২৮১	১৫৩৬.১২০
২০০২	৭৪৮০৯	১৫.৭৪৬	১৯৬৭৫৬	১৭২১.৮১৬	৬১৩১	৫৩৭৫.০০০	১৪৩৬৮	১২৫৭৯.৬৭২
২০০৩	৬৫৯১১	১০.৬২৯	১৮১৮৯৭.২	১৯০৬.১১৩	৩৩২৭	৭৬০৩.০০০	১৩২৮	১৪৭৭.১৫৪
২০০৪	৭৮২৮১	১৩.৩৭৮	১১৮৬৯২.৫	১৮৫১.৪৬৮	১২২১	১০১৩০.০০০	২০৯৪	৩০৭৪.৪৬০
২০০৫	৭৩৭৮৫	২০.১৭১	১৭৭১৩৬.৭৩	১৫৯০	৮৯৭	৭৭৬০.৫	১৭২	৫৯৪৯.৩৯৪
২০০৬	৫০০১৫	১৬.২৮৮	১৭৭৮৪০	১৩৪৫	১৯৪১	৯০২৯	১৭২	১৭৩১.৯৪
২০০৭	২৯৬৯৯১	২০.৮৫৬	১৭৩৬৩৯.৪৫	১৭৬৮	২৬০০৯	১২১৬৬	২২৭	৩৬৬১.০৫
২০০৮	৫৪১৬৯	২৯.০১৪	২১০৬৭০	২৩০২	৩৫০৮	৮২২১	২২১	৩৪২৫.০৫
মোট	৫৭০৩৬৪	১৪৩.৮৬৬	১৩৯৪১৩৮.৯	১৭১৯৯.৪৮৩	৫৫১৬৭	৭০৬৫৩.৩	২০০৩৮	৩৮৪২৩.৩৮৫

তথ্যসূত্র : তথ্য ও পরিসংখ্যান এবং কম্পিউটার সেল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সারণী-২ : ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত মাদক মামলার বিবরণ

	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	মোট
কেসের সংখ্যা	৪৫১৭	৪১৫৩	৪৪৩৫	৪৬৪৮	৫৭৪৭	৫৬১৩	৫৯৭২	৭১৯৫	৭৩৫৫	৭৫৮৯	৭৮৪২	৬৫০৬৬
আসামীর সংখ্যা	৪৪০২	৪০৭৯	৪৯৫৪	৫০৮৮	৬৮৬৩	৬৫৭৫	৬৮৫৫	৮০৮৭	৭৮২১	৮৪৭৬	৮৫৯৮	৭১৭৯৮

তথ্যসূত্র : তথ্য ও পরিসংখ্যান এবং কম্পিউটার সেল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।